শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপেক্ষিত ‘স্বাস্থ্য’ আর কতদিন?

সফিক চৌধুরী
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

দেশে এখন সবাই ব্যস্ত। সরকার ব্যস্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কার আর চতুর্মুখী দাবিদাওয়া সামলানোর কাজে, রাজনৈতিক দলগুলো ব্যস্ত রাজনৈতিক বাহাস আর আগামী নির্বাচনের সমীকরণ নিয়ে। দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই নানা ছুতোয় রাস্তায় শুধু দাবির মিছিল। এভাবে চলতে চলতে একটা সময় হয়তো নির্বাচনের ট্রেনও এসে দাঁড়াবে নাগরিকদের সামনে আর নাগরিকরাও নতুন দিনে উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু সমাজে নাগরিক সচেতনতা, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আর ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ার মূল সোপান যে শিক্ষা, তা বোধকরি সরকার, রাজনৈতিক দল আর নাগরিক হিসেবে আমরাও বিস্মৃত হতে চলেছি।

UNIBOTS

নতুন শিক্ষাবর্ষের এক মাস পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের সব পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে পারল না সরকার। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন। বই না পেয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রায় বিদ্যালয়ে আবার পুরোদমে ক্লাস চলছে। তাই বই না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়েই কিছু অভিভাবক যাদের সামর্থ্য আছে, তারা ইন্টারনেট থেকে পিডিএফ কপি প্রিন্ট নিয়ে পড়াচ্ছেন, কেউ বা চড়া দামে বাজার থেকে পিডিএফ থেকে ছাপানো বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু শহরের বিদ্যালয়ে পাঠদানের যে সুযোগ সেটি মফস্বল বা একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনেক সংকুচিত। কারণ সেখানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও সহজলভ্যতা সীমিত। আবার প্রায় সব শ্রেণিতে কারিকুলাম পরিবর্তন হওয়ায় আগের বছরের বইও তেমন কাজে আসছে না। ফলে অভিভাবকদের বড় একটি অংশ যাদের সামর্থ্য নেই, তারা বই না পেয়ে বাচ্চার পড়াশোনায় এগোতে পারছেন না, এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনায় চরম বৈষম্যেরও সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এসব কিছু ঘটছে, অথচ সবাই কেমন যেন নিশ্চল, নিশ্চুপ।

২. আমাদের সরকার এবং সেই সঙ্গে পরিবারগুলোও বিগত কয়েক বছরে আগের চেয়ে পড়াশোনার পেছনে অনেক বেশি টাকা খরচ করছে, অনেক ক্ষেত্রে করতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও হয়তো উন্নত দেশগুলোর মতো অতটা নয়। আমাদের দেশে বিগত দশ বছরে যত স্কুল তৈরি হয়েছে, যত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে এমন আগে কখনও হয়নি। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, ছেলেমেয়েরা শিখছে অতি সামান্য, শিক্ষার মান অনেকটাই নিম্নগামী। দেখা গেছে, রাজধানীসহ দেশের প্রধান প্রধান শহর এবং মফস্বলের অল্প কিছু বিদ্যালয় বাদে বেশির ভাগ প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল থেকে যারা বেরোচ্ছে, তাদের অনেকেই শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া, লেখা এবং অঙ্ক কষার গোড়ার কাজগুলোই পারছে না। এর একটি কারণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষকদের একটি অংশ তাদের নিজেদের পড়ানোর বিষয়টি সম্পর্কে নিজেরাই তেমন জানেন না, যে কারণে শিক্ষার্থীদের বোঝানোতে ঘাটতি থেকে যায়। কিন্তু শিক্ষকরা বোঝাতে না পারার হয়তো এটি একটি কারণ বটে, কিন্তু প্রধানতম কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, শ্রেনিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কে কতটা বুঝল তা নিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক নির্বিশেষে তেমন কেউই বিশেষ একটা মাথা ঘামান না। কারণ আমাদের শিক্ষা কারিকুলামে গোটা পড়াশোনাটাই সিলেবাসমুখী, শিক্ষার্থীমুখী নয়।

আবার শিক্ষকদের কেউ কেউ প্রাইভেট টিউশনির দিকে ঝুঁকে পড়ায় বিদ্যালয়ে তেমন একটা সময় দিয়ে পড়াতে উৎসাহী নন। দ্বিতীয়ত, নবীন শিক্ষকদের হাতেকলমে শিক্ষা পাওয়ার ঘাটতি তো রয়েছেই।

চীনের সাংহাইয়ের বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষকরা পুরনো অভিজ্ঞ শিক্ষকদের শ্রেনিকক্ষে উপস্থিত থাকেন। এভাবেই পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নবীন শিক্ষকদের শিক্ষানবিশি চলতে থাকে। একই বিষয়ের নতুন-পুরনো শিক্ষকরা একসঙ্গে বসে পাঠ পরিকল্পনা করেন। ফলে পড়ানো ভালো করার দিকে সহায়তা, সচেষ্টতা যেমন থাকে, ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়েও নজর থাকে; যেটা আমাদের মতো দেশে তেমন একটা দেখা যায় না।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলো শিশুদের জন্য এক ধরনের বাধ্যতার পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা নয়। এমনও শুনেছি, এক স্কুল শিক্ষার্থী ক্লাসে তার শিক্ষকের পড়ানো তথ্যের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় শিক্ষক নাকি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘তুমি শিক্ষক, না আমি?’ এমন পাল্টা প্রশ্নে শিক্ষার্থীর প্রশ্ন করার ইচ্ছাটাই দমে যায়। কোনো সমস্যার সমাধান করা, যুক্তি দিয়ে মত প্রতিষ্ঠা, ভাষায় আবেগের প্রকাশ, এগুলো শিশুরা পারছে কি না, তা নিয়ে আমাদের অনেক স্কুলই মাথা ঘামায় না, তবে ইদানীংকার কিছু স্কুলে এগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে, তবে সেই সংখ্যা অতি নগণ্য। ফিনল্যান্ডে প্রতি ৪৫ মিনিট ক্লাসের পর ১৫ মিনিট নাকি ‘ফ্রি টাইম’ দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের, যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেনিকক্ষে আরও বেশি মনোযোগী হতে পারে। উন্নত বিশ্বের ভাবনা হচ্ছে, কম পড়ালে শিশুরা যদি বেশি শেখে, তবে বেশি পড়াতে যাওয়া বোকামি!

একটি যুক্তিবাদী সমাজ তৈরি করতে গেলে শিক্ষাব্যবস্থাটাকেও যথাযথভাবে তৈরি করা প্রয়োজন। বর্তমানের কর্পোরেট সমাজ যেখানে ক্রমাগত সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে আরও নিচের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, সমাজের চরম অসাম্য সৃষ্টি করতে চাইছে, যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাজের মানবিক মুখটাকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই দিচ্ছে না, এমন নানা কিছু যখন আমাদের গ্রাস করে ফেলছে, তখন যুক্তিনির্ভর শিক্ষাই আমাদের আশার আলো দেখাতে পারে আর সেই শিক্ষার জন্য আমাদের প্রস্তুতি ও কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে এখনই।

৩. বাহ্যিক পরিকাঠামো তৈরি এবং তাকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে না পারলে তা কখনোই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। ভালো ও পরিচ্ছন্ন বাথরুমের অভাবে প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে শুধু যে শিক্ষার্থীদেরই দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় তা নয়, কিছু ব্যতিক্রম বাদে প্রায় প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষিকাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমি এমন অনেককেই জানি যারা একান্ত বাধ্য না হলে প্রতিষ্ঠানের

শৌচাগার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, সারাদিন পানি কম খেয়ে চেষ্টা করেন শৌচাগার এড়াতে। কেউ কেউ তো সকালে বের হয়ে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত পানিই খান না, পাছে শৌচাগারের প্রয়োজন পড়ে!

এভাবে টানা পানি কম খেয়ে এবং প্রস্রাব আটকে রাখার ফলে শিক্ষার্থীদের একটা অংশ এবং অনেক শিক্ষিকাই ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন বা মূত্রনালির সংক্রমণের (ইউটিআই) পাশাপাশি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ও অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি যে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, পরবর্তী সময়ে সেটাই হয়ে ওঠে তাদের সারাজীবনের পাথেয়। লেখাপড়া, গান, আঁকাআঁকি ইত্যাদির পাশাপাশি হাঁটাচলা, কথা বলা, নানা কিছু শেখানো হয় শৈশবে। এসব কিছুর মাঝে যথাযথভাবে শৌচাগার ব্যবহারের শিক্ষাও জরুরি, কারণ বাচ্চাদের সাধারণত গণশৌচাগার ব্যবহারের প্রথম অভিজ্ঞতা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। যদিও বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞতা, উদাসীনতা আমাদের সমাজে যথেষ্ট। শৌচাগারে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পাশাপাশি কীভাবে তা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তা শেখানোও জরুরি। আমরা যেন না ভুলিÑ অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার নানা রোগের আঁতুড়ঘর। শুধু শিক্ষার্থী নয়, অনেক অভিভাবকেরই তাদের বাচ্চাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা ভীতি কাজ করে। অনেকের ধারণা, এর থেকে নানা ধরনের অসুখ হয়। কিন্তু গণশৌচাগার ব্যবহার করলেই যে নানা রোগে আক্রান্ত হবে, তা নয়। শৌচাগার যদি পরিষ্কার থাকে এবং পেরিনিয়াল হাইজিন মেনে চলা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তাই স্বাস্থ্যগত কারণেই সঠিকভাবে শৌচাগার ব্যবহারের পাঠ জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার যেন যথাযথ পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে পড়ালেখার মতোই নজর দেওয়া এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও বোঝাতে হবে তারা যেভাবে বাড়ির শৌচাগার ব্যবহার করে, ঠিক সেই মানসিকতা নিয়ে বাইরের শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে। এভাবে প্রত্যেকে সচেতন থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেক সংক্রামক রোগের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে শৌচাগার দেখার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, সেই সঙ্গে জেন্ডারবান্ধব স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ থেকে ক্লাসের পঠনপাঠন, পরিবেশ ইত্যাদি শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপযোগী কি না, তা দেখভালের জন্য আমাদের দেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষ রয়েছে, কিন্তু তারা এসবের কতটা খোঁজখবর রাখে তা আমলে নেওয়া প্রয়োজন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমরা অনেক কিছুতেই আশাবাদী ছিলাম, কিন্তু নানা কিছুতে সংস্কার কমিশন এবং আলোচনা-সমালোচনা শুনতে পেলেও শিক্ষা নিয়ে আমরা কেন যেন একেবারেই নিশ্চুপ। নির্বাচন, পুলিশ, জনপ্রশাসন, তথ্য নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রস্তাব, প্রকল্প, অনুদান, সভা মিটিং-মিছিল হতে পারে, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং তাদের শিক্ষা ঘিরে কোনো পরিকল্পনা হবে না কেন? এভাবে টেনেটুনে লেখাপড়া আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে সুস্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশা দুরাশাই বটে।

সফিক চৌধুরী : বিতার্কিক ও কলাম লেখক